কোন পথে চলমান রাজনৈতিক সঙ্কট থেকে উত্তরণ

ড. বদিউল আলম মজুমদার, সম্পাদক, সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক (২৮ মে, ২০১২)

আমাদের রাজনৈতিক সঙ্কট দিন দিন জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। বহুদিন থেকেই আমাদের রাজনীতিবিদরা পরস্পরের প্রতি অসহযোগিতা, অসহিষ্ণুতা, অশ্রদ্ধা, ও আগ্রাসী আচরণ প্রদর্শন করে আসছেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিভিন্ন ইস্যুতে তাদের অনড় এবং অনেক ক্ষেত্রে অযৌক্তিক অবস্থান। যেমন, বিএনপি ও তার শরিকরা সরকারকে আল্টিমেটাম দিয়েছে ১০ জুনের মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনর্বহালের। আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন তত্ত্বাবধায়ক নয়, বর্তমান সরকারের অধীনেই আগামী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

এমনি প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে, শান্তিপূর্ণভাবে এবং নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় তথা 'রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায়' জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাসমূহ সমাধানের পথ বহুলাংশে রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এ ধরনের 'অপরাজনীতির' চর্চার কারণে ক্রমাগতভাবে রাজপথই – হরতাল, অবরোধ, সহিংসতা ইত্যাদি – হয়ে পড়েছে সমস্যা সমাধানের একমাত্র পন্থা। আর বিরোধীদের এসব কর্মকাণ্ডের প্রতিক্রিয়ায় সরকার শুরু করেছে পাল্টা রাজপথ দখলের প্রতিযোগিতা এবং দমনপীড়নের। দুর্ভাগ্যবশত অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, এ প্রক্রিয়ায় রাজপথ দখলকারীদের সাময়িক 'বিজয়' ঘটতে পারে, কিন্তু এতে সমস্যার সমাধান হয় না। এতে কিছু রাজনীতিবিদ লাভবান হলেও, দীর্ঘমেয়াদীভাবে সাধারণ জনগণ হয় চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্থ। বস্তুত, জনগণ এ অপরাজনীতির শিকারমাত্র। বর্তমান সরকার 'দিনবদলের' লক্ষে চলমান এ রাজনৈতিক সংস্কৃতি তথা অপসংস্কৃতিতে পরিবর্তন আনার অঙ্গীকার করলেও, বাস্তবে ঘটেছে তার উল্টো।

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী

আমরা মনে করি যে, আমাদের বর্তমান রাজনৈতিক সঙ্কটের কেন্দ্রবিন্দু হল সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী, যা সংবিধান বিশেষজ্ঞ, মিডিয়া প্রতিনিধি ও নাগরিক সমাজের প্রবল আপত্তি উপেক্ষা করে গত ৩০ জুন বিরোধী দলের অনপুস্থিতিতে সম্পূর্ণ একতরফাভাবে সংসদে পাশ করা হয়। গত এক বছরে সংশোধনীটি নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা হলেও, দুর্ভাগ্যবশত এ ব্যাপারে সরকারের অবস্থান এখন পর্যন্ত সম্পূর্ণ অনড়। বিরোধী দল শুধুমাত্র তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবিতে রাজপথ গরম করলেও – যা করলে তাদের ক্ষমতায় যাওয়ার পথ সুগম হতে পারে – পঞ্চদশ সংশোধনীর অন্যান্য, বিশেষত নাগরিক অধিকার সম্পর্কিত বিষয়গুলো নিয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চুপ।

পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আমাদের সংবিধানে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ, সুদূরপ্রসারী ও ভয়াবহ পরিবর্তন আনা হয়। পরিবর্তনগুলো হল: (১) শক্তি প্রদর্শন বা প্রয়োগের মাধ্যমে অথবা অন্য কোন অসাংবিধানিক পন্থায় সংবিধান বাতিল, স্থগিতের উদ্যোগ গ্রহণ বা ষড়যন্ত্র করা কিংবা সংবিধানের প্রতি নাগরিকের আস্থাহীনতা সৃষ্টি করাকে রাষ্ট্রদ্রোহিতা হিসেবে বিবেচনা করা (অনুচ্ছেদ ৭ক); (২) সংবিধানের প্রায় এক-তৃতীয়াংশকে মৌলিক কাঠামো হিসেবে বিবেচনা এবং সংশোধন অযোগ্য করা (অনুচ্ছেদ ৭খ); (৩) তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করা (অনুচ্ছেদ ৫৮খ, গ, ঘ-এর বিলুপ্তি); (৪) সংসদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগের তিন মাসে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিধান করা [১২৩(৩)]; এবং (৫) ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দান করা (অনুচ্ছেদ ২ক)। এছাড়াও সংশোধনীতে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু রয়েছে, আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান না করা যার অন্যতম।

মৌলিক অধিকার খর্বকরণ

'অনুচ্ছেদ ৭ক। সংবিধান বাতিল, স্থগিতকরণ, ইত্যাদি অপরাধ।– (১) কোন ব্যক্তি শক্তি প্রদর্শন বা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বা অন্য কোন অসাংবিধানিক পন্থায়– (ক) এই সংবিধান বা ইহার কোন অনুচ্ছেদ রদ, রহিত বা বাতিল বা স্থগিত করিলে কিংবা উহা করিবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ বা ষড়যন্ত্র করিলে; কিংবা (খ) এই সংবিধান বা ইহার কোন বিধানের প্রতি নাগরিকের আস্থা, বিশ্বাস বা প্রত্যয় পরাহত করিলে কিংবা উহা করিবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ বা ষড়যন্ত্র করিলে– তাহার এই কার্য রাষ্ট্রদ্রোহিতা হইবে এবং ঐ ব্যক্তি রাষ্ট্রদ্রোহীতার অপরাধে দোষী হইবে। (২) কোন ব্যক্তি (১) দফায় বর্ণিত– (ক) কোন কার্য করিতে সহযোগিতা বা উস্কানি প্রদান করিলে; কিংবা (খ) কার্য অনুমোদন, মার্জনা, সমর্থন বা অনুসমর্থন করিলে– তাহার এইরূপ কার্যও একই অপরাধ হইবে।'

৭ক(১)(ক) উপঅনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হবে যদি কেউ জোর করে ক্ষমতা দখল করে বা অসাংবিধানিক পন্থায় সংবিধান বা এর কোন অনুচ্ছেদ বাতিল বা স্থগিত করে বা তা করার জন্য ষড়যন্ত্র করে। সামরিক বাহিনীর মত অনির্বাচিত তথা অগণতান্ত্রিক শক্তির ক্ষমতা দখলের বিরুদ্ধে 'রক্ষাকবচ' হিসেবে এ অনুচ্ছেদ সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বলে দাবি করা হয়। পক্ষান্তরে ৭ক(১)(খ) এবং ৭ক(২) প্রযোজ্য হতে পারে রাজনৈতিক দল এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে, যা তাদেরকে অগণতান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে হাত মেলাতে নিরুৎসাহিত করবে বলে আশা করা হয়। তবে ৭ক-এর কার্যকারিতার পূর্বশর্ত হল বল প্রয়োগ বা অসাংবিধানিক পন্থা অবলম্বন। উভয় ক্ষেত্রেই 'আফটার দি ফ্যাক্ট' বা ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরই এ বিধান প্রযোজ্য হবে।

আমাদের আশঙ্কা যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা নিয়ে প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল সমঝোতায় পৌঁছাতে না পারলে, আমাদের গণতান্ত্রিক পদ্ধতি আবারো ভেঙ্গে পড়তে পারে। ফলে নির্বাচনের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে ভবিষ্যতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পথ রুদ্ধ হয়ে যেতে পারে, যা অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলের পথ প্রশস্ত করবে বলে অনেকের আশঙ্কা। আর অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল হলেই সংবিধান বাতিল বা স্থগিতের প্রশ্ন উঠবে। এ ধরনের ঘটনা ঘটলেই পরবর্তীতে যে কোন প্রতিবাদী নাগরিক ও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তাদের অতীতের প্রতিবাদের জন্য ৭ক অনুচ্ছেদ অতি সহজেই ব্যবহার করা যাবে। এমনি পরিস্থিতিতে বর্তমান ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধেও ভবিষ্যতে এ অনুচ্ছেদ ব্যবহৃত হতে পারে, যেমনিভাবে অনেক আওয়ামী লীগ নেতাই তাদের সময়কার করা 'বিশেষ ক্ষমতা আইনে'র অধীনে বছরের পর বছর জেল খেটেছিলেন। অর্থাৎ আমাদের রাজনীতিবিদরা এখন দায়িত্বশীল আচরণ না করলে ৭ক অনুচ্ছেদ নাগরিকের বাক-স্বাধীনতার এবং তাদের অস্তিত্বের প্রতি ভবিষ্যতে চরম হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে।

৭ক অনুচ্ছেদ কি অগণতান্ত্রিক শক্তির ক্ষমতা দখলের বিরুদ্ধে আসলেই রক্ষাকবচ? ৭ক অনুচ্ছেদ প্রয়োগ করা যাবে অবৈধ ক্ষমতাদখলকারী এবং তাদের তথাকথিত দোসরদের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে ক্ষমতাদখলকারীদের ক্ষমতা ত্যাগের পর। অর্থাৎ এটির তাৎক্ষণিক প্রয়োগ সম্ভব নয়। আর সময়ের ব্যবধানে নদীতে অনেক জল গড়ায় ও প্রেক্ষাপট বদলে যায় এবং পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে এ বিধানের প্রয়োগ সম্ভব নাও হতে পারে। এমনি অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে অবৈধ ক্ষমতা দখলকারীরা এবং তাদের সমর্থকরা নিরুৎসাহিত হবেন কি-না তা নিয়ে অনেকের মনেই সন্দেহ রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে পাকিস্তানের উদাহরণ টানা যেতে পারে। জুলফিকার আলী ভূট্টোর নেতৃত্বে ১৯৭৩ সালে প্রণীত পাকিস্তানের সংবিধানে এমনি একটি বিধান ছিল। বস্তুত পাকিস্তানকে অনুসরণ করেই আমাদের সংবিধানে ৭ক অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু পাকিস্তানের সংবিধানে এমন বিধান থাকা সত্ত্বেও জেনারেল জিয়াউল হকের বল প্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল এবং ভূট্টোকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝোলানো রোধ করা সম্ভব হয়নি। একইভাবে জেনারেল পারভেজ মোশারফের অবৈধ ক্ষমতা দখল রোধ করা যায়নি এবং তিনি এখনও বহাল তবিয়তেই আছেন।

মৌলিক কাঠামো নিয়ে অশুভ খেলা

'অনুচ্ছেদ ৭খ। সংবিধানের মৌলিক বিধানাবলী সংশোধন অযোগ্য।– সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সংবিধানের প্রস্তাবনা, প্রথম ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, দ্বিতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, নবম-ক ভাগে বর্ণিত অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলী সাপেক্ষে তৃতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ এবং একাদশ ভাগের ১৫০ অনুচ্ছেদসহ সংবিধানের অন্যান্য মৌলিক কাঠামো সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলী সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন, রহিতকরণ কিংবা অন্য কোন পন্থায় সংশোধনের অযোগ্য হইবে।'

এই অনুচ্ছেদের মাধ্যমে সংবিধানের এক-তৃতীয়াংশকে মৌলিক কাঠামো হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। যেকোন সংবিধানের কতগুলো মৌলিক বৈশিষ্ট্য থাকে – যেমন, গণতন্ত্র, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা – যেগুলো আদালত, এমনকি সংসদও পরিবর্তন করতে পারে না। এগুলো পরবর্তনের জন্য গণপরিষদ বা গণভোটের প্রয়োজন হয়।

বিষয়টি সম্পর্কে আরও সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়ার জন্য একটি উদাহরণের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। একটি ইমারতের পিলারগুলো এর মৌলিক কাঠামোর অংশ, কিন্তু দরজা-জানালা বা দেওয়াল নয়। কারণ পিলার ভেঙ্গে পড়লে ইমারত ধ্বসে পড়তে পারে, কিন্তু দেওয়াল ভাঙ্গলে তা ধ্বসে পড়বে না। তাই সংবিধানের এক-তৃতীয়াংশ এর মৌলিক কাঠামোর অংশ হতে পারে না।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিলুপ্তি

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলুপ্ত করা হয়েছে। নিয়তির পরিহাস যে, বর্তমান ক্ষমতাসীন দলই প্রবল আন্দোলনের মাধ্যমে এ ব্যবস্থা ১৩তম সংশোধনীর মাধ্যেমে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ১৯৯৬ সালে তখনকার বিএনপি সরকারকে বাধ্য করেছিল। আর এখন বিএনপিই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য মরিয়া। প্রসঙ্গত, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে, বিশেষত আদালত অঙ্গনে কিছু ঘটনা ঘটেছে যা অনেকেরই জানা নেই।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংবিধানে অন্তর্ভুক্তির পর ১৯৯৬ সালে এটিকে চ্যালেঞ্জ করে আদালতে প্রথম রিট হয়। বিচারপতি মোজাম্মেল হক এবং বিচারপতি এমএ মতিন সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ রায় দেন যে, 'We find that no unconstitutional action was taken by the legislature and as such, we do not find any reason to interfere with the 13 Amendment Act' [*মশিউর রহমান বনাম বাংলাদেশ*, ১৭বিএলডি(১৯৯৭)], পৃ. ৩৭।

পরবর্তীতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করে আরেকটি মামলা হয়। বিচারপতি মো: জয়নুল আবেদিন, বিচারপতি আওলাদ আলী ও বিচারপতি মির্জা হায়দার হোসেনের সমন্নয়ে গঠিত বৃহত্তর বেঞ্চে শুনানির পর এ ব্যবস্থাকে বৈধ বলে আদালত রায় দেন। রায়ে বলা হয়: 'If democracy is expected as a basic structure of the Constitution, then free and fair election is also a part of it. Without free and fair election democracy can never be practiced in the true sense. So, it can rightly be said that free and fair election is an essential postulate of democracy and one of the fundamental aims of our society as enshrined in the preamble of the Constitution. It appears that 13th Amendment has actually strengthened and improved the system of holding free, fair and impartial election by which the people can exercise their fundamental right freely in electing the government' [*সালিম উল্যা বনাম বাংলাদেশ*, ৫৭ডিএলআর (২০০৫)], পৃ-১৯৭।

দ্বিতীয় রায়টির বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করা হয়। গত ১০ মে, ২০১১ তারিখে প্রদত্ত একটি বিভক্ত ও সংক্ষিপ্ত আদেশে উচ্চ আদালত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে 'প্রসপেকটিভলি' বা ভবিষ্যতের জন্য অসাংবিধানিক বলে ঘোষণা করেন। তবে আদালত তাঁর আদেশে সংসদ ইচ্ছা করলে আরও দুই টার্মের জন্য বিধানটি রাখতে পারেন বলে পর্যবেক্ষন দেন। লক্ষণীয় যে, আদালতে পূর্নাঙ্গ রায় প্রকাশের আগেই এবং আদেশের পর্যবেক্ষন সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে অবিশ্বাস্য দ্রুততার সঙ্গে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বর্তমান সরকার তত্ত্বাবধায়কের বিধান সংবিধান থেকে বিলুপ্ত করে।

আদালতের রায়ের দোহাই দিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি বাতিল করা হলেও, অনেক নাগরিকের ধারনা যে, নির্বাচনকালীন একটি নিরপেক্ষ সরকার ছাড়া সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব নয়। এ ধারণা সংবিধান বিশেষজ্ঞ থেকে শুরু করে সর্বস্তরের নাগরিকদের মধ্যে বিরাজমান। উদাহরণস্বরূপ, সম্প্রতি *প্রথম আলো* এ বিষয়টির ওপর দুটি অনলাইন জরিপ পরিচালনা করে। গত ১৮ মে ২০১২ তারিখে পরিচালিত জরিপে 'তত্ত্বাবধায়করূপী দানব আর মানুষ দেখতে চায় না – প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যের সঙ্গে আপনি কি একমত?' প্রশ্নের উত্তরে ছয় হাজার ৪৯৩ জন অংশগ্রহণকারীর মধ্যে ৮৬.৪২ শতাংশই 'না' উত্তর দেন। 'হ্যাঁ' উত্তর দিয়েছেন মাত্র ১২.৬১ শতাংশ। ৭ মে ২০১২ তারিখে পরিচালিত অপর জরিপে 'তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের পক্ষে ইউনূস ও আবেদ – আপনি কি তাদের সঙ্গে একমত?' প্রশ্নের ছয় হাজার ৬৩৬ জন উত্তরদাতাকারীর মধ্যে ৯০.১৯ শতাংশই 'হ্যাঁ' উত্তর দেন।

যুগান্তরের গত জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে পরিচালিত দুটি অনলাইন জরিপ থেকেও দেখা যায় যে দেশের অধিকাংশ জনগণ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে। 'বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া বলেছেন, নির্দলীয় বা অন্তবর্তী সরকারের অধীনে নির্বাচন হতে হবে' এ বক্তব্য সম্পর্কে মতামতপ্রদানকারী মোট এগার হাজার ৩১৬ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৭০ শতাংশই এর সঙ্গে একমত পোষণ করেছেন। তেমনিভাবে ড. কামাল হোসেনের 'তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন করতে গোটা জাতি ঐক্যবদ্ধ' এ বক্তব্যের ওপর ছয়ত্রিশ হাজার ৩৮৩ জন মতামতদানকারীর মধ্যে ৬৬ শতাংশ এর সঙ্গে একমত হয়েছেন। আনলাইন জরিপ বিজ্ঞানসম্মতভাবে পরিচালনা করা হয় না, তবুও জরিপের ফলাফল জনমত সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা প্রদান করে।

বিচারক ও বিশেষজ্ঞদের মতামতের বিষয়ে আসা যাক। এ পর্যন্ত হাইকোর্টের দুটি বেঞ্চের পাঁচজন বিচারপতি এ বিধানের পক্ষে রায় দিয়েছেন। আমরা জানি না আপিল বিভাগের কয়জন বিচারক সংখ্যাগরিষ্ঠদের সঙ্গে আছেন, তবে এ কথা বোধহয় নিরাপদে বলা যায় যে, এ মামলার সঙ্গে যুক্ত হাইকোর্ট ডিভিশন ও আপিল বিভাগের বিচারকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বহাল রাখার পক্ষে, যদিও আপিল বিভাগের রায়ই এ বিষয়ে শেষ কথা। (এ সংখ্যা সমান সমানও হতে পারে।) তবে আপিল বিভাগে এ্যমিকাস কুরি (আদালতের বন্ধু) হিসেবে মতমত দেওয়া আটজন বিশেষজ্ঞের মধ্যে – জনাব টিএইচ খান, ড. কামাল হোসেন, ড. এম জহির, ব্যরিস্টার রফিক-উল হক, জনাব মাহমদুল ইসলাম, ব্যরিস্টার আমিরুল ইসলাম, ব্যরিস্টার আজমামুল হোসেন কিউসি এবং ব্যরিস্টার রোকনউদ্দিন মাহমুদ – সাতজনই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পক্ষে। একমাত্র আজমালুল হোসেন কিউসি এ বিধান বাতিলের পক্ষে। এমনকি আমাদের এটর্নি জেনারেল জনাব মাহবুবে আলমও আপিল বিভাগে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা রাখার পক্ষে মত দিয়েছেন।

সমাজের বিশিষ্টজনদের বড় অংশও আগামী নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠানের পক্ষে। উদাহরণস্বরূপ, সংবিধান সংশোধনের লক্ষে গঠিত সংসদীয় বিশেষ কমিটির আহবানে তিনজন সাবেক বিচারপতি, ১১ জন শীর্ষ আইনজীবি, ১৮ জন সম্পাদক ও জেষ্ঠ সাংবাদিক এবং ১৮ জন বুদ্ধিজীবি সাড়া দিয়ে বক্তব্য রাখেন। এঁদের অধিকাংশই তত্ত্বাবধায়ক সরকার রাখার পক্ষে মত দেন এবং কেউই এর বিপক্ষে কথা বলেননি। এমনকি ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগও কমিটির সামনে এ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার বিরোধিতা করেনি। তাই এটি সুস্পষ্ট যে, সরকারের বর্তমান প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও, পরবর্তী নির্বাচন একটি দল নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সারাদেশে একটি ঐক্যমত্য বিরাজ করছে।

সংসদের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে নির্বাচন

পঞ্চদশ সংশোধনীর একটি ভয়াবহ দিক হল সংসদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগে নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিধান। সংশোধিত সংবিধানের ১২৩(৩)(ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, 'সংসদ-সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে (ক) মেয়াদ-অবসানের কারণে সংসদ ভাংগিয়া যাইবার পূর্ববর্তী নব্বই দিনের মধ্যে'। এমন বিধান অন্য কোন সংসদীয় ব্যবস্থায় রয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

এ বিধান দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানকে আরও ভয়াবহ করে তুলবে বলে অনেকের আশঙ্কা। অনেকদিনের ললিত অপসংস্কৃতির কারণে বর্তমানে সরকার দলীয় সংসদ সদস্যগণ এবং স্থানীয় নেতৃবৃন্দ স্থানীয় পর্যায়ে প্রায় সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করেন। অনেক ক্ষেত্রেই থানা-পুলিশের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রায় নিরঙ্কুশ। শোনা যায় যে, তাঁদের সম্মতি ছাড়া থানা কোন মামলা নেয় না এবং চার্জশিট দেয় না। সংসদের মেয়াদোত্তীর্ণের আগে নির্বাচন হলে নির্বাচনের সময়েও তারা এ ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারবে। আর এ ক্ষমতা ব্যবহার করে তাঁরা বিরোধী দলের প্রার্থী এবং সম্ভাব্য প্রার্থীদেরকে এলাকা ছাড়া করতে পারে। এমনি পরিস্থিতিতে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের আশা দূরাশায় পরিণত হতে বাধ্য।

ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি

পঞ্চদশ সংশোধনীর কারণে সংবিধানের ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কিত ঘোষণার মধ্যে একটি চরম গোজামিল সৃষ্টি হয়েছে। সংশোধিত সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'বিস্‌মিল্লাহির-রহ্‌মানির রহিম' বজায় রাখা হয়েছে। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে বহাল রাখা হয়েছে। অষ্টম অনুচ্ছেদে ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতা এবং কোনো বিশেষ ধর্মকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান একসঙ্গে যেতে পারে না। এছাড়াও ধর্ম একটি বিশ্বাস – প্রতিষ্ঠান নয় – এবং এর রাষ্ট্রীয়করণ অযৌক্তিক। আমাদের দেশের সাতজন বিশিষ্ট নাগরিক 'তবু কেন রাষ্ট্রধর্ম' শীর্ষক একটি নিবন্ধে এ ব্যাপারে সম্প্রতি তাঁদের ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন (*প্রথম আলো*, ১৫ জুলাই ২০১১)।

এবিষয়ে আরেকটি গুরুতর স্ববিরোধিতা সৃষ্টি করা হয়েছে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বাহাত্তরের সংবিধানের ১২ অনুচ্ছেদ পুনঃস্থাপিত করার ফলে। এ অনুচ্ছেদে বলা আছে: 'ধর্ম নিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা। ধর্ম নিরপেক্ষতা নীতি বাস্তবায়নের জন্য (ক) সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা, (খ) রাষ্ট্র কর্তৃক কোন ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান, (গ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মীয় অপব্যবহার, এবং (ঘ) কোন বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তাহার ওপর নিপীড়ন, বিলোপ করা হইবে।' একযোগে ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসেবে ফিরিয়ে আনা, ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে বজায় রাখা এবং ১২ অনুচ্ছেদে 'রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান' ও 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মীয় অপব্যবহার' নিষিদ্ধ করা চরমভাবে স্ববিরোধী। এধরনের স্ববিরোধিতা পুরো বিষয়কেই হাস্যাস্পদ করে ফেলেছে।

সংবিধানে একদিকে 'বিস্‌মিল্লাহির-রহ্‌মানির রহিম' ও রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলামকে বজায় রাখার পেছনে যুক্তি দেওয়া হয় যে, আওয়ামী লীগ তা না করলে উগ্রবাদীরা তাদের বিরুদ্ধে ধর্মহীনতার অভিযোগ তুলে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করবে, যার প্রভাব নির্বাচনের ওপর পড়বে। এটি একটি খোঁড়া যুক্তি। কারণ আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে এধরনের অপপ্রচার অতীতে ঘটেছে, এমনকি গত জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও। কিন্তু তাতে আওয়ামী লীগ কি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে? তবে এ ধরনের আপোষকামিতার কারণে ধর্মনিরপেক্ষ দল হিসেবে আওয়ামী লীগ তার বৈশিষ্ট্য বহুলাংশে হারিয়ে ফেলেছে এবং তার প্রধান রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের সঙ্গে পার্থক্য বহুলাংশে দুরীভূত হয়ে গিয়েছে। অশুভ ঐক্যমত সৃষ্টি হয়েছে তাদের মধ্যে ধর্মসহ অনেকগুলো স্পর্শকাতর বিষয়ে।

কোন পথে উত্তরণ

এটি সুস্পষ্ট যে, বিরাজমান রাজনৈতিক সংস্কৃতি (বরং অপসংস্কৃতি) আমাদের জন্য চরম সঙ্কট সৃষ্টি করেছে। চলমান সঙ্কটে নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে রকেটিক গতিতে একতরফাভাবে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী সংসদে পাশ করার মাধ্যমে। এ সংশোধনীর ফলে সকলের অংশগ্রহণে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনই অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজন প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংলাপ। সংলাপে মিডিয়া, ব্যবসায়ীক সম্প্রদায় এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, জরুরিভিত্তিতে সংলাপ অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সারাদেশে ব্যাপক জনমত বিরাজ করছে।

নাগরিকদের একটি বিরাট অংশের দাবি সত্ত্বেও, ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সংলাপে বসতে আগ্রহী বলে মনে হয় না। ক্ষমতাসীনদের মনোভাব হল যে, বিরোধী দল সংসদে এসে তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্পর্কে তাদের প্রস্তাব/বিল উত্থাপন করবে, যা নিয়ে সংসদে বক্তৃতা-বিতর্ক হবে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠদের মতামতের ভিত্তিতে এর ভাগ্য নির্ধারিত হবে।

সরকারের এ অবস্থান সকলেরই জানা এবং এটি অতি পুরানো খেলা। অনেকেরই স্মরণ আছে যে, ২০০৫ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী ১১-দলের পক্ষ থেকে নির্বাচন প্রক্রিয়া, নির্বাচন কমিশন, রাজনৈতিক দল ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার সংস্কারের লক্ষে কতগুলো বলিষ্ঠ প্রস্তাব জাতির সামনে উত্থাপন করেছিলেন এবং এগুলো গ্রহণের জন্য বিভিন্নভাবে, বিশেষত রাজপথের আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারের ওপর চাপ দিতে থাকেন। বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে তখনকার সরকার এসব প্রস্তাবের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে সংসদ বর্জনকারী বিরোধী দলকে সংসদে এসে তা উত্থাপন করার আহবান জানান। শেখ হাসিনা তা করেছিলেনও, কিন্তু তার পরিণতি আমাদের সকলেরই জানা। বর্তমান ক্ষেত্রেও সংসদে এসে বিরোধী দলের প্রস্তাব/বিল উত্থাপন থেকে ভাল কিছু ঘটবে বলে আশা করা যায় না। তবে বিরোধী দলের সংসদে এসে প্রস্তাব উত্থাপনে দোষের কিছু নেই, বরং তা করাই যৌক্তিক। এছাড়াও তাদের লাগাতার সংসদ বর্জন সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য।

লক্ষণীয় যে, আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে বিরোধী দলই সাধারণত নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবিতে সংলাপের পক্ষে এবং সরকারি দল এর বিপক্ষে অবস্থান নেয়। কারণ পরবর্তী নির্বাচনে বিজয় নিশ্চিত করতে সরকারি দল এমন কিছু 'ম্যানুপুলেশন' বা কারসাজি করে, যা সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের পথে

গুরুতর বাধা হয়ে দাঁড়ায়। যেমন, ২০০১ সালের নির্বাচনের আগে তৎকালীন চারদলীয় জোট সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশনকে দলীয়করণ করে একটি পাতানো নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নিয়েছিল। একইভাবে বর্তমান সরকার সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলুপ্ত করে দলীয় সরকারের অধীনে এবং মেয়াদোত্তীর্ণ ও সংসদ বিলুপ্ত হওয়ার আগেই আগামী সংসদ নির্বাচনের পাঁয়তারা করছে। এ ধরনের কারসাজি গণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রতি আমাদের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সুদৃঢ় অঙ্গীকারের অভাবেরই প্রতিফলন।

প্রসঙ্গত, সংসদে সংলাপ হয় না। সংসদ মূলত আইন প্রণয়ন, বক্তব্য প্রদান, বিতর্ক অনুষ্ঠান ও সংসদীয় কমিটির মাধ্যমে সরকারের স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার স্থান। সংসদের কার্যক্রম পরিচালিত হয় আনুষ্ঠানিকভাবে এবং *কার্যপ্রণালী-বিধি* অনুসরণ করে। ফলে সংসদ ফ্লোরে এবং সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষে গঠিত সংসদীয় কমিটিগুলোতেও সংলাপের কোন সুযোগ নেই। তাই বিরোধী দলকে সংসদে এসে সংলাপে অংশগ্রহণের প্রস্তাব জনগণকে বিভ্রান্ত করার প্রচেষ্টারই সামিল।

তবে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব সৈয়দ আশরাফুল ইসলামের সর্বশেষ বক্তব্য অনুযায়ী, সরকার অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের রূপরেখা নিয়ে আলোচনায় বসতে আগ্রহী, যদিও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সর্বশেষ অবস্থান হলো যে, আগামী নির্বাচন দলীয় সরকারের অধীনেই অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে বিএনপি'র নেতৃত্বে ১৮ দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না বলে ইতোমধ্যে ঘোষণা দিয়েছে। বরং বিরোধী দল সরকারের পক্ষ থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা মেনে নেওয়াকে সংলাপের পূর্বশর্ত করার দাবি করেছে। তাই অনতিবিলম্বে সংলাপ অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা অতি ক্ষীণ বলেই মনে হয়।

তবে সংলাপ এবং কয়েকটি বিষয়ে ঐক্যমত সৃষ্টি হতেই হবে। কারণ বর্তমান প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থান অযৌক্তিক এবং কোন অযৌক্তিক ব্যবস্থাই 'সাসটেইনেবল' বা টেকসই নয়। কিন্তু শুধুমাত্র তত্ত্বাবধায়ক নিয়ে সংলাপ এবং ঐক্যমত আমাদের বিরাজমান কলুষিত রাজনৈতিক সংস্কৃতির এবং অকার্যকর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্থায়ী, এমনকি কোন সমাধানই নয়। বরং এটি আমাদের বিরাজমান রুগ্ন রাজনীতির সমস্যারই 'সিমটম' বা উপসর্গমাত্র। আর এ কারণেই গত চার চারটি নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হলেও আমদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুসংহত হয়নি, বরং আরও অস্থিতিশীল হয়েছে। তবে বর্তমান প্রেক্ষাপটে সবার অংশগ্রহণে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের খাতিরে নির্বাচনকালীন একটি দলনিরপেক্ষ সরকারের সম্ভবত কোন বিকল্প নেই।

রোগের চিকিৎসা করতে হলে এর কারণ চিহ্নিত করা আবশ্যক। তাই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার দাবির পেছনের তথা সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পথের বাধাগুলো চিহ্নিত এবং তা দূর করা আজ জরুরি।

সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পথে একটি বড় বাধা হলো আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক, স্বচ্ছ ও দায়বদ্ধ রাজনৈতিক দলের অনুপস্থিতি এবং দলের নেতাকর্মীদের গণতান্ত্রিক রীতিনীতি চর্চার ব্যাপারে অনীহা। এছাড়াও আমাদের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো বর্তমানে দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়নের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। তবে দল ছাড়া গণতন্ত্র হয় না, তাই আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে কার্যকর করতে হলে রাজনৈতিক দলগুলোর গভীর সংস্কার আবশ্যক।

আমাদের মাননীয় স্পীকারের সাম্প্রতিক বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, আমাদের মাননীয় সংসদ সদস্যদের ৭০ শতাংশই ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি। বস্তুত রাজনীতি আমাদের দেশে আজ বহুলাংশে 'ব্যবসায়ে' পরিণত হয়েছে। আর নির্বাচনে টাকার খেলা আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য এক ভয়াবহ হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এছাড়াও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডও সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পথে একটি বড় অন্তরায়। এসব সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের নির্বাচনী প্রক্রিয়ার আরও সংস্কার প্রয়োজন।

প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দলীয়করণ এবং তাদেরকে অন্যায় সুযোগ-সুবিধা প্রদানও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পথে একটি বিরাট প্রতিবন্ধকতা। তাই আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে কার্যকর করতে হলে দলতন্ত্র ও ফায়দাতন্ত্রের অপসংস্কৃতির অবসান আজ জরুরি।

সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের অসহযোগিতা এবং রাজনৈতিক দলগুলোর আইন মানার ক্ষেত্রে অনীহা অনেকসময় কমিশনকে ঠুঁটো-জগন্নাথে পরিণত করে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষে কমিশনকে সত্যিকারার্থেই স্বাধীন ও শক্তিশালী করতে হবে। কমিশনে নিরপেক্ষ ও নির্ভীক ব্যক্তিদেরকে নিয়োগ প্রদানও এ ক্ষেত্রে অপরিহার্য।

আমাদের ভঙ্গুর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে কার্যকর করতে হলে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত ব্যক্তিদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং জিতে আসার পথ সুগম করতে হবে। এ লক্ষে নির্বাচনে প্রার্থীদের প্রদত্ত তথ্যের সঠিকতা যাচাইয়ের ব্যাপারে আরও কঠোর হতে হবে। আর সঠিক ব্যক্তিরা নির্বাচিত হয়ে আসলে এবং জনকল্যাণমূখী রাজনৈতিক দল গড়ে উঠলেই আমাদের জাতীয় সংসদ কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে। এ জন্য আরও প্রয়োজন হবে সংসদ ও মন্ত্রীপরিষদের সদস্যদের জন্য যথাযথ আচরণবিধি প্রণয়ন এবং তাঁদের বাৎসরিকভাবে সম্পদের হিসাব প্রদান। প্রসঙ্গত, এসবের অঙ্গীকারই দিনবদলের সনদে রয়েছে, যদিও তা বাস্তবায়ন করা হয়নি।

বিরাজমান দুর্নীতি-দুর্বৃত্তায়নের সংস্কৃতির অবসান এবং দায়বদ্ধতার কাঠামোকে জোরদার করাও আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে কার্যকর করার জন্য অপরিহার্য। ক্ষমতায় গিয়ে যদি পাঁচ বছরের জন্য 'ইজারাতন্ত্র' প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়, তাহলে ছলে-বলে-কলে-কৌশলে নির্বাচনে জেতার জন্য রাজনৈতিক দলগুলো বদ্ধপরিকর হওয়াই স্বাভাবিক। তাই একটি দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়া এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে পুনঃগঠন আমাদের অগ্রাধিকারের অংশ হওয়া আবশ্যক।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটি সুস্পষ্ট যে, ভবিষ্যতের নির্বাচনকে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য করতে হলে এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করাতে হলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ইস্যুসহ পঞ্চদশ সংশোধনীর সংশোধনের লক্ষ্যে একটি সমঝোতা হওয়া আবশ্যক। তবে শুধু সমঝোতা হলেই হবে না, সমস্যাগুলোর স্থায়ী সমাধান হতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন হবে একটি সর্বব্যাপী বলিষ্ঠ সংস্কার কর্মসূচী। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে অনুষ্ঠিত সংলাপের মাধ্যমেই এ ধরনের 'হোম-গ্রোউন' সমাধান সম্ভব। তাই পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ১৯৯০-এর তিন জোটের রূপরেখার মতো একটি 'জাতীয় সনদ' আজ প্রণীত হওয়া জরুরি, যদিও সংসদীয় পদ্ধতির পুনঃপ্রতিষ্ঠা ছাড়া তিন জোটের রূপরেখার আর কোনটিই বাস্তবায়িত হয়নি। এজন্য অবশ্য প্রয়োজন হবে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর জনস্বার্থ সমুন্নত রাখার প্রতি দৃঢ় প্রত্যয়। আশাকরি আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সদিচ্ছা ও প্রজ্ঞার পরিচয় দেবেন এবং আবারও খাল কেটে কুমীর আনার চেষ্টা থেকে বিরত থাকবেন।